চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, চাণক্য, শঙ্করাচার্য্য, ও বিজয়সিংহের পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তান্তে যে সকল সদ্‌গুণের পরিচয় আছে, তাহা সকলেরই অনুকরণীয় এবং এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়ার সম্ভব। ভরসা করি বিদ্যালয়ের বালকদিগকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত ভক্তিভাবে পাঠ করাইয়া সকলেই তাহাদিগকে সদ্‌গুণের পক্ষপাতী করিতে যত্ন করিবেন।

কয়েকজন বিজ্ঞ বন্ধুর অভিপ্রায় অনুসারে এই সপ্তম সংস্করণে ইহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত, নোটগুলি পরিত্যক্ত ও পুস্তকখানি বড় অক্ষরে মুদ্রিত করা হইল। পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না।

অষ্টম সংস্করণেও অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা।

আর্য্যচরিত।

প্রথম ভাগ

কবিগুরু বাল্মীকি।

কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার প্রকৃত নাম রত্নাকর। রত্নাকর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র নিতান্ত দূষিত ছিল। তিনি একটী নীচজাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন এবং সুযোগ পাইলে পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইতেন। এই পাপবৃত্তিই তাঁহার জীবনোপায় ছিল।

একদা রত্নাকর দূর হইতে কতিপয় তপস্বীকে কানন পথে গমন করিতে দেখিয়া নিজ কুপ্রবৃত্তি সাধন মানসে বেগে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন

এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? দাঁড়াও, আর যাইতে হইবে না।” ঋষিগণ রত্নাকরের তথাবিধ ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন ও মর্ম্মভেদী ভৈরব স্বর শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, “ভদ্র! তোমাকে উপবীতধারী দেখিতেছি, তুমি কি ব্রাহ্মণতনয়? তবে তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ ভয়ানক বেশে আগমন করিয়া কঠোরস্বরে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ? কোন কু অভিপ্রায় তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, এমত সম্ভব বোধ হয় না।” রত্নাকর কহিলেন, “আমি ব্রাহ্মণতনয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি অনেক পরিবারে বেষ্টিত। তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণহস্তে প্রতিদিন বনে বনে ভ্রমণ করি, পথিক দেখিলেই তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লই। অদ্য আমার সৌভাগ্যবশতঃ তোমরা এই পথে আগমন করিয়াছ। অতএব তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে, অবিলম্বে প্রদান কর, নতুবা এইক্ষণেই আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে। ঋষিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিলেন, “তোমার কথা মত আমাদিগের সমুদায় তোমাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি; কিন্তু তোমাকে একটী কথার উত্তর দিতে হইবে। তুমি

যাহাদিগের জন্য এই নিতান্ত ঘৃণাকর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহারা কি তোমার এই পাপ-কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়া, পরকালে কিয়ৎপরি-মাণেও তোমার নরকযন্ত্রণার লাঘব করিবে? তুমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাহারা তোমার পাপের অংশ গ্রহণে সম্মত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের যাহা আছে, সমুদায় তোমাকে প্রদান করিব, বলপ্রকাশ করিতে হইবে না। তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানে থাকিব, কোথায়ও যাইব না। যদি বিশ্বাস না হয় আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও।” ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকরের মনে চিন্তার উদয় হইল এবং তিনি যে পাপকর্ম্ম করিতেছেন, তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিবারবর্গের মনোগত ভাব জানিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন।

গৃহে যাইয়া স্ত্রী ও পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন “তোমাদিগকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রকৃত উত্তর দাও, কদাচ মিথ্যা বলিও না।” তাহারা সত্য বলিতে স্বীকার করিলে, রত্নাকর কহিলেন, আমি নিত্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক মনুষ্যের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি, তাহাতে অনেক সময় অনেকের প্রাণ বিনাশ

পর্য্যন্ত করিতে হয় ; এই প্রকারে আমি যে অর্থ আহ-রণ করি, তাহা আমি একাকী উপভোগ করি না, তোমাদিগকে অংশ দিয়া থাকি। বলিতে কি, কেবল তোমাদিগের সুখসম্পাদনের নিমিত্তই আমাকে এই পাপবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পাপ কর্ম্মের ফল কি আমি একাকী ভোগ করিব ? না তোমরা ইহার অংশ গ্রহণ করিবে ?” রত্নাকরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা কহিল, “আমরা তোমার পোষ্য ; আমাদিগকে প্রতি-পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; কেন না যখন বিবাহ করিয়াছ, তখনই স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। যখন সন্তানের জন্মদান করিয়াছ তখনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছ। তজ্জন্য তুমি পাপ কর কি পুণ্য কর, তুমিই তাহার ফল ভোগ করিবে, আমরা তাহার অংশ কি জন্য গ্রহণ করিব ? তবে তোমার স্ত্রী বা পুত্র বলিয়া লোক-সমাজে আমরা ঘৃণিত বা পূজিত হইতে পারি।” পরি-বার বর্গের এই সকল কথা শুনিয়া, রত্নাকরের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল, তখন বুঝিলেন তিনি কি ভয়া-নক পাপাচারী।

রত্নাকর অবিলম্বে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ঋষিগণসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ দূরে

নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে করুণবচনে কহিলেন, "হে পরম দয়াবান্ মহর্ষিগণ! আমি নিতান্ত নারকী, আমার তুল্য দুষ্কৃতকারী বোধ হয় জগতে আর নাই। আজি আপনাদিগের প্রভাবে বুঝিতে পারিলাম এতাবৎ কাল আমি কেবল দুষ্কর্ম্মেই যাপন করিয়াছি। এক্ষণে দয়া করিয়া আপনাদিগের অনুরূপ কার্য্য করুন। সাধুসমাগমের ফল প্রত্যক্ষ হউক। যাহাতে আমি দুস্তর নরক হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনারা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।" ঋষিগণ রত্নাকরের এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পরস্পর কহিলেন, "এই দুর্ব্বৃত্ত সাধুগণের উপেক্ষ্য হইলেও যখন শরণাগত হইয়াছে, তখন সদুপদেশ প্রদান দ্বারা ইহার উদ্ধার সাধন করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া রত্নাকরকে কহিলেন, "অগ্রে তোমার মনের একাগ্রতা ও পবিত্রতা সম্পাদন করা আবশ্যক, নচেৎ উপদেশের ফললাভ হইবে না। অতএব কিছু দিন মনে মনে রাম নাম জপ কর। রত্নাকর 'রাম' বলিতে গিয়া 'আম' বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জিহ্বা এতাদৃশ জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, কিছুতেই 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তখন ঋষিগণ শব্দটী উল্টাইয়া অর্থাৎ 'ম রা, ম রা' এই প্রকার শিক্ষা দিয়া রাম শব্দ উচ্চারণ

করিতে শিখাইলেন। রাম শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না বলিয়া রত্নাকরের মনে আরও ঘৃণার উদয় হইল। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনন্য-মনে রাম নাম জপ ও ইন্দ্রিয়সংযম করিতে লাগিলেন। তিনি এমনই অনন্যমনে যোগ সাধন করিতেন যে, তাঁহার শরীর জড়পদার্থবৎ নিশ্চল থাকিত। নিকটস্থ পুত্তিকা সকল জড়পদার্থ ভ্রমে তাঁহার শরীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কিছুদিন গত হইলে, ঋষিগণ রত্নাকরকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রত্নাকর একাগ্রচিত্তে জপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার শরীরে বল্মীক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার অব-লোকন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরি-শেষে তাঁহাকে যথাযোগ্য উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন, "রত্নাকর! তোমার শরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, অতএব অদ্যাবধি, তোমার নাম বাল্মীকি হইল।" সেই দিন হইতে দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইলেন। অচিরকালমধ্যে তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে, নানা স্থান হইতে

বহুসংখ্যক শিষ্য আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

একদা মহর্ষি বাল্মীকি, তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান্, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিত সাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয় সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূ-য়ার বশবর্ত্তী নহেন? রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পুলকিত মনে কহিলেন, "তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তৎসমুদায় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন, তিনিই এই সকল অমানুষ গুণগ্রামে বিভূষিত। আমি তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; অবহিতচিত্তে শ্রবণ

কর।” এই বলিয়া তিনি রামের জীবন বৃত্তান্ত সমস্তই সংক্ষেপে বাল্মীকির নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সীতা উদ্ধার ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শেষে কহিলেন, “হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতারণ পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক হইবে।”

বাল্মীকি নারদের মুখে এইরূপ রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তমসানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নদীর অবতরণ প্রদেশ কর্দ্দমশূন্য দেখিয়া অবগাহন মানসে শিষ্যের নিকট হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বনে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান করিতেছিল। এইসময়ে কোন ব্যাধ আসিয়া তন্মধ্য হইতে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্তকলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চকে নিষাদকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদসাগরে

মগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইল। তখন তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্ম-জনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন,—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতিঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

অর্থাৎ "রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্, অতএব তুই কখনও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না।"

যে রত্নাকর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অহরহঃ মনুষ্য-জীবন নষ্ট করিতেন, আজি সেই রত্নাকর একটী পক্ষীর মৃত্যুতে কত দুঃখিত হইয়াছেন ও তাহার হন্তা ব্যাধকে কতই নিন্দা করিতেছেন। জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! সাধুসঙ্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সাধুসঙ্গ-প্রভাবে নরাধম রত্নাকর দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নরোত্তম বা দেবত্বায় পরিণত হইল। যিনি জ্ঞান-সম্পন্ন তিনিই মনুষ্য; নরদেহ বিশিষ্ট হইলেই মনুষ্য হয় না।

বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি বলিলাম! অন-ন্তর প্রধান শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, "বৎস! আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ, অক্ষর

বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা যখন আমার শোকাবেগ প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহা শ্লোক নামে প্রথিত হওয়া উচিত।" তদবধি চরণবদ্ধ বাক্য অর্থাৎ পদ্যময় রচনা সকল শ্লোক নামে অভিহিত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি কেবল উপরি উক্ত কবিতাটী মাত্র রচনা করেন নাই, তিনি রামায়ণ নামে সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। মহর্ষি তাহাতে সমগ্র রাম-চরিত চমৎকার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

বাল্মীকি মনে মনে সেই শোকোদ্ভূত নবরচিত শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান ও পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা আসনে উপবিষ্ট ও অনাময় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সহাস্যমুখে মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এবিষয়ে সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্প প্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত

হইয়াছে ; অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত বর্ণন কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, ততদিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচলিত থাকিবে এবং ততদিন তোমার কীর্ত্তি-শরীর ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি ধর্ম্ম ও কামপ্রতিপাদক সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ পদার্থের আধার শ্রবণমনোহর রামচরিত রচনা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে সর্ব্বগুণসম্পন্ন রামচন্দ্র লঙ্কাযুদ্ধে জয়ী হইয়া, অযোধ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহর্ষি রামায়ণ রচনা করেন। আশি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হওয়ার যে কথা প্রচলিত আছে, উহা সম্পূর্ণ জনপ্রবাদ মাত্র। বাল্মীকি প্রথমে রাবণবধ পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড প্রণয়ন করিয়া, রামতনয় লব ও কুশকে অধ্যয়ন করান, পরে উত্তরকাণ্ড প্রণয়ন করেন। লব কুশ বাল্মীকির আশ্রমে ভুমিষ্ঠ ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ পরম রূপবান্, সেই

রূপ সুকণ্ঠ ছিলেন। বাল্মীকি আপন গ্রন্থ প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনে সমগ্র রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে মনোহরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। একে বাল্মীকির রচনা অতি মধুর, তাহাতে সমধিক রূপবান্ কলকণ্ঠ শিশুদ্বয় গান করাতে তাহা এমনই চমৎকার হইয়াছিল যে, বোধ হয়, পৃথিবীতে তাহার তুল্য সুমধুর গীতি আর কেহ কখন শুনে নাই। অতি অল্প দিনেই সর্ব্বত্র বাল্মীকির রচনাপারিপাট্য ও শিশুদ্বয়ের সঙ্গীতনিপুণতার যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইল। যেখানে তাঁহারা গান করিতেন তথায় এত শ্রোতা আগমন করিত যে, কিছুতেই সকলের স্থান হইত না। রাম এই সংবাদ পাইয়া লব ও কুশকে নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ স্বচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

বাল্মীকি প্রথম কবি "মা নিষাদ" কবিতা প্রথম কবিতা এবং রামায়ণ প্রথম কাব্য। কেবল ভারতবর্ষের কেন বোধ হয় উহা সমগ্র পৃথিবীর প্রথম কাব্য। এই জন্যই বাল্মীকির কবিকুল-গুরু নাম হইয়াছে। অতএব সকলেরই অন্ততঃ ঐ আদিম শ্লোকটী অভ্যাস করিয়া রাখা উচিত। উহা ভারতবাসীর—সমগ্র মানবমণ্ডলীর অপূর্ব্ব গৌরবের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা

ও উচ্চ নিদর্শন। আদিম শ্লোক বলিয়া পরিচয় দিতে জগতে আর নাই।

বাল্মীকি কেবল আদি কবি নহেন, তিনি মহা-কবি। তাঁহার রচনা অতি মধুর; সরল ও হৃদয়গ্রাহী। উৎকৃষ্ট কল্পনা শক্তিতে তিনি ভারতের সকল কবি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার স্বভাববর্ণনা অতি চমৎকার। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা একবার বাল্মীকি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই।" তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।" ফলতঃ কবিতার প্রথম প্রদর্শক হইয়া তিনি যেরূপ কাব্য লিখিয়াছেন, অনেক মহাকবি উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াও সেরূপ পারেন নাই।

বাল্মীকি রাজনীতিবিশারদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভূগোল-বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

বেদব্যাস।

মহর্ষি ব্যাস কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ভারত-বীর ভীষ্মের বিমাতা যশস্বিনী সত্যবতী তাঁহার জননী ও স্বনামখ্যাত সংহিতা প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি পরাশর তাঁহার পিতা। অতি শৈশবকাল হইতে বিদ্যাভ্যাসে দৃঢ় মনঃসংযোগ করাতে ব্যাস সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এজন্য তাঁহার একটী নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এজন্য আর একটী নাম দ্বৈপায়ন এবং বেদ বিভাগ করেন এজন্য তিনি 'মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস' নামে অভিহিত হয়েন।

তিনি অতি দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অল্প দিনে সমাপন করিবার অভিলাষে তিনি একজন লেখক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথাও না পাইয়া পরিশেষে গণেশদেবকে আহ্বান করিয়া মনোমত অভিপ্রায় জানাইলেন। গণেশ অতি ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; অনর্গল বলিয়া গেলেও তিনি অনায়াসে

লিখিতে পারিতেন, একটী বর্ণও পড়িয়া যাইত না। তিনি কহিলেন, "যদি আমার লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে তাহা হইলে আপনার লেখক হইতে পারি।" ব্যাস কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন "আমি তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু আমি যাহা বলিব আপনি তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া লিখিতে পারিবেন না।" গণেশ তাহাই স্বীকার করিলেন। কেন না তিনি কেবল লেখক ছিলেন না, সকল বিদ্যারই পারদর্শী ছিলেন। এই নিয়মে ভগবান গণেশ ব্যাসরচিত মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাস মধ্যে মধ্যে এমত এক একটী কূটার্থ শ্লোক রচনা করিতে লাগিলেন যে, তাহা বুঝিতে গণেশের অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেই অবসরে ব্যাস বহুতর শ্লোক রচনা করিয়া লইতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি লক্ষাধিকশ্লোকময় বিস্তীর্ণ মহাভারত গ্রন্থ সমাপন করেন। উহার মধ্যে অষ্টশত অতি কূটার্থ শ্লোক আছে। উহাদিগকে ব্যাসকূট বলে। ব্যাসকূট সকল অত্যন্ত দুরূহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া, প্রথমে স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়ন অর্জ্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়কে শ্রবণ করান। তদবধি মহাভারত শ্রবণের প্রথা

হইয়াছে। মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। ইহাকে পুরাণ, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র বা কাব্য যাহা ইচ্ছা বলা যায়। সর্ব্ব প্রকার বিষয়ই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রাবিধান বাণিজ্য কৃষি ও শিল্প শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট নিয়মাদি, পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার, রাজা ও ঋষ্যাদির আখ্যান, জীবনচরিত ও বংশাবলী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ইহাতে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানবগণ ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রবাদ এই যে, মহাভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতে যাহা নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। কোন পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে, গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, অসামান্য কবিত্বশক্তি ও গ্রন্থের প্রগাঢ় ভাবমাধুরীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কল্পনা শক্তিতে বেদব্যাস পৃথিবীর অনেক মহাকবিকে পরাস্ত করিয়াছেন। মোটের উপর ধরিলে, মহাভারতের তুল্য কাব্য পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক বঙ্গযুবকগণ প্রায়ই মহাভারত পাঠ করেন না। তাঁহারা নভেল নামধারী রাশি রাশি ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিবেন, কিন্তু যে গ্রন্থ কাব্যের রাজা, ভারতীয় গৌরবের চরম

নিদর্শন, মানবমাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব পরিচয় ও যাহা পাঠ করিলে মানবের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্যই অবগত হওয়া যায়, সেই অমানুষ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ হয় না।

ব্যাস বেদ বিভাগ করেন। বেদে পদ্য, গদ্য ও গীতি এই তিন প্রকার রচনা আছে, এজন্য বেদের অপর একটী নাম ত্রয়ী। অঙ্গীরা বংশীয় মহর্ষি অথর্ব্বা উহা হইতে কিয়দংশ নির্ব্বাচন করিয়া স্বীয় নামে অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ নামে সেই অংশ প্রচারিত করেন; মহর্ষি ব্যাস ঐ ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন সমুদায় বেদ রচনা অনুসারে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করেন। পদ্যময় রচনাবলী ঋক্ নামে, গদ্যময় রচনাবলী যজু নামে এবং গীতময় রচনাবলী সাম নামে প্রসিদ্ধ করেন। সেই অবধি এক বেদ চারিবেদ নামে খ্যাত হইল।

ব্যাস প্রথম পুরাণসংগ্রহকর্ত্তা অর্থাৎ তিনিই প্রথমে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বকালে যে সকল রাজবংশাবলী ও সৃষ্টি বিবরণ প্রভৃতি লোকের মুখে ও প্রসঙ্গতঃ কোন কোন গ্রন্থে ছিল, বেদব্যাস সেই সমস্ত সংগ্রহ করেন ও আপন জীবৎ কালে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় একত্র করিয়া একখানি পুরাণ রচনা করেন। সেই পুরাণ তিনি লোমহর্ষণকে শিক্ষা দেন। অষ্টাদশ পুরাণ ও

অষ্টাদশ উপপুরাণ ব্যাসরচিত বলিয়া প্রথিত, কিন্তু নব্য পণ্ডিতগণ বলেন "সে সমস্তই তাঁহার প্রণীত নহে, যদি সকল গুলিই তাঁহার প্রণীত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ সে সকলের আকার বৃদ্ধি করিয়াছেন. অর্থাৎ পরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিত অনেক শ্লোক ও অনেক অধ্যায় প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যিনি যখন যে বিষয় সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তাহা সাধারণের নিকট সমধিক আদরণীয় করিবার জন্য ব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যদি সমুদায় পুরাণ গুলির সমুদায় অংশ ব্যাস-প্রণীত হইত, তাহা হইলে কখনই ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এক এক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইত না। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই প্রক্ষেপে পরিপূর্ণ ; অধিক কি তৎকৃত মহাভারত মধ্যেও রাশি রাশি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অধ্যায় আছে। সুতরাং কোন্ খানি বা কোন্ খানির কোন্ অংশ ব্যাসদেবের সুল-লিত লেখনীবিনির্গত তাহা এখন নিশ্চয় করা কঠিন।"

বেদান্তদর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রও মহর্ষি বেদ-ব্যাস-প্রণীত। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে বেদান্তদর্শন অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; তাহাতে বেদব্যাস আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি পৃথিবীর কোন দেশে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ও মহিমা নির্ণীত

হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষেই হইয়াছে। দেবান্তদর্শনই সেই গৌরবের মূল ভিত্তি। ঐ মূল অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণ ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন। বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকৃতি ও কার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে চমৎকার বিচার আছে, তাহা শুনিলে মোহিত হইতে হয়।

ব্যাস মহাকবি, দার্শনিক, ইতিহাসবিৎ, রাজনীতিবিশারদ, বিজ্ঞানাভিজ্ঞ, বহুভাষাজ্ঞ, অর্থশাস্ত্রবিৎ ও ব্যবহারকুশল ছিলেন। তৎকালপ্রচলিত বিদ্যামাত্রেরই তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মহাকবি কালিদাস।

সাধারণের বিশ্বাস প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল কালিদাস ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন তিনি ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। কালিদাস বাল্যকাল কেবল ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লেখা পড়ার নামও করেন নাই।

বিবাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণ পরিচয়ও হয় নাই। প্রবাদ এই যে, তিনি যেমন মূর্খ ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিও সেইরূপ স্থূল ছিল। তিনি এতদূর স্থূলবুদ্ধি ছিলেন যে, একদিন একটী গাছের ডালের আগায় বসিয়া সেই ডালের গোড়া কাটিতেছিলেন। ডাল পড়িয়া গেলে যে তৎসঙ্গে আপনি পড়িয়া যাইবেন, এ মোটা কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই প্রবাদ নিতান্ত অলীক বোধ হয়। কেন না তিনি মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় তাঁহার কাব্য সকলে বিলক্ষণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

সারদানন্দন নামা নৃপতির বিদ্যোত্তমা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা যেরূপ রূপলাবণ্যবতী তদনুরূপ বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন, অন্যথা তিনি বিবাহ করিবেন না। নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক রাজকুমার পণ্ডিতবর্গ বিবাহার্থী হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হয়েন। সকলে এইরূপে হতমান হইয়া বিদ্যোত্তমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্ত্রীলোকের এতাদৃশী ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার অসহ্য মনে করিয়া পরামর্শ করিলেন, যে কোন রূপেই হউক একটী গণ্ডমূর্খের সহিত ইঁহার বিবাহ দিবেন। তদনুসারে তাঁহারা

চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া কালিদাসকে ঈপ্সিত পাত্র স্থির করিলেন।

পণ্ডিতগণ কালিদাসকে পণ্ডিত বেশ ধারণ করাইয়া বিদ্যোত্তমার নিকট উপস্থিত করিলেন। কৌশলে স্থির হইল মৌখিক বিচার হইবে না, সাঙ্কেতিক বিচার হইবে। কালিদাস যখন সভায় প্রবেশ করেন, তখন সভাস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী ও রাজন্যবর্গ তাঁহাকে দেখিয়া মহা সম্ভ্রম সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন ও মহা সমাদরে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন, ইনি অবশ্যই একজন মহা বিখ্যাত পণ্ডিত হইবেন। বিচার আরম্ভ হইলে কালিদাস একটী অঙ্গুলি দেখাইলেন; বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন, কালিদাস বুঝি এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন। তিনি তাহার উত্তরে তিন অঙ্গুলি দেখাইলেন. অর্থাৎ এক ঈশ্বর হইতে স্বত্ব, রজঃ, তম, ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়াছেন। কালিদাস দুইটি অঙ্গুলি দেখাইলেন। বিদ্যোত্তমা বুঝিলেন কালিদাস পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। এই প্রকারে কালিদাসের যখন যাহা মনে আসিতে লাগিল, সেই প্রকারে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিদ্যোত্তমা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সকল সঙ্কেতের এমনই চমৎকার অর্থ করিতে লাগিলেন ও কালিদা-

সের পাণ্ডিত্যের এমনই প্রশংসা করিলেন যে, তাহা-তেই বিদ্যোত্তমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কালিদাস বিচারে জয়লাভ করিলে, মহা আড়ম্বরে বিদ্যোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

বিবাহানন্তর রজনীযোগে কালিদাস ও বিদ্যোত্তমা একত্র শয়ন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে একটি উষ্ট্রের শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিদ্যোত্তমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের শব্দ শুনা যাইতেছে?' কালিদাস যে উত্তর দিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, "উষ্ট ডাকি-তেছে।" তাঁহার জড়জিহ্বা হইতে 'উষ্ট্র' শব্দ নির্গত হইল না। বিদ্যোত্তমা শুনিবামাত্র এত চমৎকৃত হই-লেন যে, প্রথমে তাঁহার বোধ হইল তাঁহার শুনিবার ভ্রম হইয়াছে। এজন্য পুনরায় কহিলেন, 'কি বলিলে?' কালিদাস বিদ্যোত্তমার প্রশ্নের স্বর শুনিয়া বুঝিলেন তিনি অশুদ্ধ বলিয়াছেন। এজন্য শুদ্ধ করিয়া বলি-লেন, 'উট্র' ডাকিতেছে। প্রথমবারে 'র' ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, এবারে 'ষ' উচ্চারণ হইল না। বিদ্যো-ত্তমা শ্রবণ মাত্র শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, পণ্ডিতেরা চাতুরী করিয়া ঘোর মূর্খের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। অনেক অনেক মহাপণ্ডিত ত্যাগ করিয়া শেষে তাঁহাকে যে গণ্ড-

মূর্খ বিবাহ করিতে হইল, এই দুঃখ তাঁহার মর্ম্মভেদী হইল। তিনি দুঃখে হতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন ও নানাপ্রকার পরিতাপ-বাক্যে রোদন করিতে লাগি-লেন। কালিদাস ভার্য্যার ক্রন্দন ও পরিতাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া, সেই মুহূ-র্ত্তেই আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু পরি-শেষে অনেক ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সমধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে গৃহে আসিব, নতুবা এ জন্মে আর দেশে মুখ দেখাইব না।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা শিখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দূরদেশে কোন আচা-র্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবা রাত্রি পরিশ্রম সহ-কারে বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ঈদৃশ লজ্জা, দুঃখ ও ঘৃণার উদয় হইয়াছিল যে, কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশকেই ক্লেশ বিবেচনা না করিয়া অহো-রাত্র কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা অতি তীক্ষ্ণ ছিল, সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। এত অল্প দিনে এত অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বিবেচনা করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া

দুঃখসন্তপ্তা রমণীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন।

কালিদাসের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইলে উজ্জয়িনীপতি সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সভাসদ্‌রূপে বরণ করিলেন। ক্রমে তিনি তাঁহার নব-রত্নের শিরোরত্ন হইলেন।

কালিদাসের যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, নিম্নলিখিত জন-প্রবাদটী তাহার পোষকতা করিতেছে। ভোজ নামে কোন নৃপতির সভামধ্যে কএক জন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। কোন শ্লোক বা গ্রন্থ কেহ একবার, কেহ দুই বার, কেহ তিনবার মাত্র শ্রবণ করিলে তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিয়া-ছিলেন, "যিনি আমার সভামধ্যে কোন নূতন কবিতা বলিতে পারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাই-বেন।" ঐ পারিতোষিকের লোভে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া মহারাজকে শুনাইতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা শ্রবণমাত্র তত্তৎশ্লোক পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করতঃ একে একে আবৃত্তি করিতেন সুতরাং সকলেই নিরুত্তর হইয়া চলিয়া যাইতেন। কালিদাস ভোজরাজের এই চতুরতা বুঝিতে পারিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিলেন।

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নো বা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততো মে॥"

অর্থাৎ মহারাজ? আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট হইতে ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনার সভাসদ পণ্ডিতেরা এ কথা জানেন, অতএব তাহা আমাকে অবিলম্বে প্রদান করুন। যদি পণ্ডিতবর্গ না জানেন, তবে এই শ্লোকটী আমার নূতন। অতএব আমি অঙ্গীকৃত লক্ষ মুদ্রা পাইতে পারি। কালিদাস ভোজরাজ-সমক্ষে এই কবিতা পাঠ করিলে শ্রুতিধরগণ 'এই শ্লোক জানি না বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই প্রকারে কালিদাস একটী সামান্য কথার কৌশলে পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কালিদাসের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ঐরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তৎসমুদায় সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে বিলক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা ঐ সকল দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্য; অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক; মেঘদূত, নলোদয়, ঋতুসংহার ও মহাপঞ্চষটক্

প্রভৃতি খণ্ডকাব্য এবং স্মৃতিচন্দ্রিকা প্রভৃতি কালজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থেই কালিদাস আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহাকেই বলিতে হইবে, তাঁহার তুল্য কবি পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্ষপিয়র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন কবিরই সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না। সেক্ষপিয়র মানবহৃদয় বর্ণনাকার্য্যে কালিদাসের সহিত তুলিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু অপর সকল বিষয়েই কালিদাস তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচনার এমনই সুমধুরতা যে, শ্রবণমাত্র মন মোহিত হয়—অর্থগ্রহ না হইলেও তাহা মিষ্ট বোধ হয়। প্রবাদ এই যে, কর্ণাটাধিপতি তাঁহার মুখ-নিঃসৃত চারিটী কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সমুদয় কর্ণাট রাজ্য তাঁহাকে দান করেন। অধিক কি, জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটে অভিজ্ঞান শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত

করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" একজন বিদেশীয় ব্যক্তি অনুবাদের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া যখন এরূপ প্রশংসা করিলেন, তখন আমরা আর কি বলিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিব? কালিদাসের নাম অতি সামান্য লোক পর্য্যন্তও জানে। তাঁহার নামের এমনই গৌরব যে, সকলেই স্বরচিত কবিতা তাঁহার নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে; সামান্য প্রহেলিকা রচনা করিয়া লোকে "কহে কবি কালিদাস" বলিয়া শেষ করিয়া দেয়।

কালিদাসের উপমা অতি চমৎকার। তিনি এরূপ সংক্ষেপে ও এরূপ লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা সঙ্কলন করেন যে, পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই সুমধুর শব্দবিন্যাস, সুন্দর উপমা এবং চমৎকার স্বভাব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শব্দাড়ম্বর ও শব্দালঙ্কার দ্বারা তিনি কখন গ্রন্থ নীরস করিতেন না। অনেকে ভাবিতে পারেন কালিদাসের সে শক্তি ছিল না, কিন্তু নলোদয় পাঠ করিলে সে সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। নলোদয়ে তিনি শব্দালঙ্কারের চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবাদ এই যে, বিক্রমাদিত্যের অন্যতম

রত্ন ঘটকর্পর স্বনামখ্যাত একখানি যমক রচনাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "যিনি আমার ন্যায় যমক রচনা করিতে পারিবেন, আমি খর্পর (খাপরা) দ্বারা তাঁহার জল বহন করিব।" কালিদাস ঘটকর্পরের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। বাস্তবিক নলোদয়ের যমক অতি উৎকৃষ্ট।

কালিদাস কেবল কবি ছিলেন না। বিজ্ঞান-শাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কাব্য সকল মধ্যেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যোগাকর্ষণ শক্তি পদার্থের কাঠিন্যের কারণ, জলকণাসমূহসহ সূর্য্যকিরণ সংযোগে রামধনুর উৎপত্তি, জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ জোয়ার ভাঁটার কারণ, সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের জ্যোতিঃ, পৃথিবীর ছায়া দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি অনেক বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সিদ্ধ কথা কালিদাসের কাব্য সকল মধ্যে দৃষ্ট হয়। যখন কাব্যমধ্যে এই সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ঐ সকলে যে তিনি সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি মেঘদূতে গিরি, নদী ও প্রদেশ সকলের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রঘুবংশে রঘুদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ভূগোল বিদ্যায় তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল।

কালিদাস এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ও এইরূপ অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এরূপ অভিমানশূন্য ও বিনীত ছিলেন এবং আপনাকে এত ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতেন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রথমে লিখিয়াছেন,—

'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥'

অর্থাৎ রঘুবংশ বর্ণন আমার পক্ষে ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হওয়ার চেষ্টার ন্যায় হইতেছে। দীর্ঘকায় ব্যক্তির লভ্য ফল-লাভের নিমিত্ত বামন যেরূপ হস্তোত্তোলন করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, আমিও সেইরূপ কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া উপহাসাস্পদ হইব।

বুদ্ধ শাক্যসিংহ।

শাক্যসিংহ প্রায় ২৫ শত বৎসর পূর্ব্বে হিমগিরি সমীপস্থ ভাগীরথীতীরে কোশলরাজ্যের অন্তর্গত কপিলবাস্তু গ্রামে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যবংশোদ্ভব শুদ্ধোদন রাজা তাঁহার জনক। অগ্রহায়ণ

মাসে একদা মায়াদেবী, লুম্বিন নামক মনোহর উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় পদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, মায়াদেবী একটী বৃক্ষতলে শাক্যসিংহকে প্রসব করেন। জন্মের সাত দিন পরে শাক্যসিংহ মাতৃহীন হয়েন। পিতৃব্যপত্নী গৌতমী তাঁহাকে লালন পালন করেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করাতে শুদ্ধোদন রাজার মনোভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ ও সর্ব্ব-সিদ্ধার্থ হইল। শাক্যবংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ নামে বিখ্যাত হয়েন। অসা-ধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি অচিরে শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহ অপরিমিত বলশালী ছিলেন। একদা রাজপথে পতিত একটী বৃহৎ বৃক্ষ অবলীলাক্রমে তুলিয়া স্থানান্তরে নিক্ষেপ করেন।

কিশোর বয়সেই তিনি সহাধ্যায়ীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে সময় নষ্ট না করিয়া নিবিড় বনমধ্যস্থিত নির্জ্জন প্রদেশে একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকি-তেন। রাজা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থা সংসার-বৈরা-গ্যের হেতুভূত মনে করিয়া অচিরে তাঁহারে পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজমন্ত্রিগণ বিবাহের প্রস্তাব করিলে, শাক্যসিংহ কহিলেন, "যদি

মনোমত কন্যা পাই তবে বিবাহ করিতে পারি।" অনেক অনুসন্ধানের পর গোপা নাম্নী এক অসামান্য রূপ-গুণ-সম্পন্না কুমারী সিদ্ধার্থের উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। গোপার পিতা দণ্ডপাণি প্রথমে শাক্যসিংহকে মনুষ্যত্বহীন ও বিষয়জ্ঞানশূন্য স্থির করিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবিধ গুণসম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বলবীর্য্যসম্পন্ন জানিতে পারিয়া আহ্লাদ সহকারে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কথিত আছে দণ্ডপাণির প্রতিজ্ঞা ছিল যিনি শিল্পবিদ্যায় নিপুণ হইবেন তাঁহাকেই তিনি কন্যাদান করিবেন। শাক্যসিংহ সমস্ত শিল্পবিদ্যায় নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি এতাদৃশী পরমসুন্দরী ও সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী পাইয়াও যশোধারা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোধারার গর্ভে রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্র হয়।

শাক্যসিংহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালাবধি সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও ঐ সকল সুখে আসক্ত হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুবর্গকে বলিতেন, 'পাপময় পৃথিবীতে কিছুই স্থির নহে, কিছুই সত্য নহে, সকলই অস্থায়ী, সকলই অসত্য! জীবন, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নিকণার ন্যায়

প্রজ্বলিত হইয়া অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কে জানে কোথা হইতে এ জীবন আসিল ও কোথায় গমন করিবে?" যখনই তিনি কোন বৃদ্ধ আতুর বা মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিতেন, তখনই তিনি ভাবিতেন, মনুষ্য মাত্রই এইরূপ জরা, রোগ ও মরণের অধীন, এ দেহের গৌরব বৃথা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। রাজা পুত্রের মানসিক অবস্থার এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা শাক্যসিংহ এক কৃষকের কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাহার ও তৎপরিবারের নিতান্ত দুরবস্থা দর্শনে অতি-মাত্র ব্যথিত চিত্তে সাংসারিক অনিত্য সুখের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদ্যানমধ্যস্থ এক জম্বুবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া জগতের আদি, অন্ত ও মনুষ্যের ক্ষণস্থায়ী সুখের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তিতে সন্তোষের পূর্ণ বিকাশ অবলোকন করিয়া যুবরাজ মনে মনে ভাবি-লেন সন্ন্যাসাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাই প্রশংসনীয়

এবং ইহাই অনুস্মরণীয়। সন্ন্যাসি-জীবন সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং সর্ব্বকালে বিজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও গৃহে আসিয়া পিতা ও সহধর্ম্মিণীগণের নিকট আপনার কঠোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোপা প্রেমপূর্ণ বচনে কত বুঝাইলেন, হৃদয়বিদারক নানাপ্রকার খেদ ও আর্ত্তনাদ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া সেই দিন দ্বিপ্রহর রজনীকালে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অশ্বশালা হইতে এক বায়ুবেগগামী বলবান্ তুরঙ্গম গ্রহণ করিয়া তাহাতে আরোহণ পুরঃসর সংসারের মায়া ও সুখের আলয় সুরম্য রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে ঈপ্সিত সন্ন্যাসাবলম্বে যাত্রা করিলেন। রক্ষকগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল, সুতরাং কেহ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিল না। কেবলমাত্র অশ্বপাল সমভিব্যাহারে সমস্ত রাত্রি নিশাচর পরিপূর্ণ বিপদ্-সঙ্কুল কাননপথ অতিবাহন করিয়া প্রত্যূষে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অশ্বরক্ষককে স্বীয় বহুমূল্য সুবর্ণহীরকখচিত গাত্রাভরণ সকল দান করিয়া কপিলবাস্তু

নগরে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। কহিলেন "পিতা ও বন্ধুবর্গকে কহিবে তাঁহারা যেন আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হয়েন। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিব।

ভৃত্য প্রস্থান করিলে, তিনি সেই স্থানেই শিখাচ্ছেদন ও রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিকবসন পরিধান করিলেন। তিনি প্রথমে বৈষাল নামক নগরে গমন করিয়া তিন শত শিষ্য-বেষ্টিত একজন সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট যে উপদেশ লাভ করিলেন তাহাতে তাঁহার সম্যক তৃপ্তি হইল না। অর্থাৎ সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এমন কোন সদুপদেশ তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। তখন মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহ নগরের অপর এক ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐরূপ ঈপ্সিত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মগধরাজ বিম্বসার তাঁহাকে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকিলেন না। এই স্থানে তিনি স্বমতানুযায়ী পাঁচ জন শিষ্য প্রাপ্ত হয়েন।

শাক্যসিংহ রাজগৃহ নগর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ শিষ্য সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী এক কাননে ছয় বৎ-

সর অতি কঠোর তপঃসাধন করেন। ছয় বৎসর অতীত হইলে, তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল 'তাপসব্রত আত্মাকে শান্ত এবং মনকে পরিশুদ্ধ না করিয়া বরং ধর্ম্মপথের ব্যাঘাত ও বাধাস্বরূপ হইয়া উঠে।' আরও তিনি দেখিলেন যে, অনাহারে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং বুদ্ধিরও অল্পতা হইতেছে। তখন তিনি তাপসব্রতের কঠোর নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া উত্তমরূপ পানভোজন আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় শিষ্যগণ তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র দুঃখ বা অপমান বোধ করিলেন না। প্রত্যুত তদবধি নির্জ্জনে থাকিয়া অনন্যমনে ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণ মতসমূহ ও কঠোর তাপসব্রত মনুষ্যবর্গকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, এই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। তখন মুক্তির প্রশস্ত পথ কি, কি করিলে মানবগণ দুঃখময় সংসারের দুঃখরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহার মনে বলবতী হইল। বহুদিন চিন্তা করিয়া যাহা তিনি স্থির করিলেন, তাহাই যে মুক্তির একমাত্র পথ, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই সময় হইতে তিনি "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী নাম প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম

৩৬ বৎসর মাত্র। মহর্ষিকপিলকৃত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনই তাঁহার এই নূতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

এক্ষণে তাঁহার এই ধর্ম্মমত পৃথিবীস্থ মনুষ্যবর্গের নিকট প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। মনুষ্যবর্গ অজ্ঞান-কূপে নিমগ্ন রহিয়াছে ও অলীক ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃত পথের অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া, তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি প্রথমে বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনার প্রধান স্থান বারাণসী নগরে গমন করিলেন। তথায় প্রথমে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সেই পঞ্চ শিষ্যকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে সহস্র সহস্র নগরবাসী তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তথা হইতে ছয় জন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহ নগরে গমন করেন। তত্রত্য কালান্তক নামক সুপ্রসিদ্ধ মঠে তিনি একটী গভীর ভাবরস সমন্বিত ও নীতিগর্ভ বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন, এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। পরে শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়া ধর্ম্মসূত্র প্রচার ও কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ঐ নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই প্রকারে মথুরা, উজ্জয়িনী, কামরূপ ও বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া বহুতর লোককে স্বীয় ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ তীরস্থ রাজাদিগের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ ছিল, তিনি সেই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহাকে কপিলবাস্তুতে আনিবার জন্য একবার আটজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা শাক্যসিংহের সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণে ভুলিয়া গেল ও তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিল। পরে রাজা চর্কনামা একজন মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও দূতগণের ন্যায় শাক্যসিংহের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পরিশেষে রাজা কপিলবাস্তুতে ন্যগ্রোধ নামক এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পুত্রকে আনয়ন করিলেন। 'বুদ্ধ' আখ্যা প্রাপ্ত হইবার দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি ঐ বিহারে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় আসিয়া তিনি শাক্যবংশীয় সকলকেই স্বমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে তিনি এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি ও প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শালবৃক্ষদ্বয়ের তলে উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ আসামের অন্তঃপাতী কুশীগ্রাম ও কেহ কেহ বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদীতীরস্থ কুশীনগর তাঁহার

মৃত্যুস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার মৃতদেহ তৎকালীন সম্রাটদিগের রীত্যনুসারে দাহ করা হয়। চিতাভস্ম লইয়া মগধ, প্রয়াগ, কপিলবাস্তু প্রভৃতি অষ্ট দেশের লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। পরিশেষে এক ব্রাহ্মণ ঐ ভস্ম আটভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। সকলেই আপন আপন দেশে ঐ ভস্মোপরি এক এক চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ঐ ভস্মবিভাগকারী ব্রাহ্মণ ভস্মপাত্র ও অপর এক ব্যক্তি চিতাবশিষ্ট অঙ্গার লইয়া তদুপরি পৃথক্ পৃথক্ চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল চৈত্যের কয়েকটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার চারিটি দন্ত এতদ্দেশের স্থানে স্থানে নীত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ ঐ দন্ত অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শাক্যসিংহ রাজকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ, বৃক্ষতলে বসিয়াই সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ও বৃক্ষতলে বসিয়াই মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন. তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম লোকের এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তৎকালে অপর সকল ধর্ম্মই নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মও লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অদ্যাপি পঁয়তাল্লিশ কোটী মনুষ্যকে

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে চলিতে দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এত অধিক নাই।

শাক্যসিংহ কেবল বৌদ্ধদিগের পূজ্য নহেন, হিন্দুরাও তাঁহার প্রতি সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে, একটি অংশ মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য।

সহস্র বৎসরেরও অধিক গত হইল, শঙ্করাচার্য্য মালবর প্রদেশের নাম্বুরী-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি কর্ণাট দেশান্তর্গত তুঙ্গভদ্রা-নদীতীরবর্ত্তী শিঙ্গাভেরী নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শিবগুরু তাঁহার পিতা। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন সংস্কারের পর তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার এরূপ চমৎকার মেধা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল যে, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন পঞ্চমবৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয় ও অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে তিনি বেদাদি সমস্ত

অধ্যয়ন করিয়া গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি নিখিল বেদ এবং সকল প্রকার দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং সেই সকল হইতে তর্কজাল উত্থাপিত করিয়া মহাপণ্ডিতদিগকেও পরাজিত করিতেন। অতি সুকুমার বয়সে তাঁহার এতাদৃশী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসামান্য বিদ্যা ও প্রৌঢ়োচিত বিজ্ঞতা দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্য প্রথম বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতৃভাষার বর্ণমালা মুখে মুখে শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বর্ষে লিখিত বর্ণ সকল চিনিয়া পড়িতে শিখিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বৎসরে কাব্য ও পুরাণ সকল শুনিয়া শুনিয়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এরূপ চমৎকার স্মরণশক্তি ছিল যে, যাহা একবার শুনিতেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। তাঁহাকে শিখাইবার জন্য গুরুকে অণুমাত্র কষ্ট পাইতে হইত না, বরং তাঁহাদ্বারা গুরুর অনেক শ্রমের লাঘব হইত। তিনি অনেক সময়ে সহাধ্যায়ীদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেন।

অতি-অল্প বয়সে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ বলেন, তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে

তিনি গৃহকার্য্য দেখিতে বাধ্য হয়েন। সেই বয়সেই সংসারের সমুদায় ভার তাঁহার উপর পড়িল। এমন অর্থ সঙ্গতি ছিল না যে, তদ্দ্বারা অনায়াসে দিনপাত হইতে পারে, সুতরাং তাঁহাকে জীবনোপায় সংস্থান ও সাংসারিক সমুদায় কার্য্য সমাধা করিতে হইত। শঙ্করাচার্য্য এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হয়েন নাই। যে অবসর পাইতেন, তাহা কেবল বিদ্যাশিক্ষাতেই যাপন করিতেন, ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম করিতেন না।

তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ভূপতিগণও দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার গৃহে আসিতে লাগিলেন। স্বয়ং কেরলাধিপতি তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থে তাঁহার কিছুমাত্র লোভ ছিল না, তিনি সে সকল গ্রহণ না করিয়া কহিলেন, "ঐ সকল ধন দরিদ্রদিগকে দান করুন, আমার উহাতে প্রয়োজন নাই। শঙ্করের মাতা তাঁহার গুণে এরূপ সুখী হইয়াছিলেন যে, তিনি একদিনও বৈধব্যজনিত কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই।

অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছিল। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া

ছিলেন, অকৃতদার হইয়া ঈশ্বরোপাসনা ও ধৰ্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। মাতার স্নেহপূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণে তৎকালে স্বীয় অভিপ্রায় সাধনে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি সে অভিপ্রায় সাধনে আপাততঃ বিরত হইলেন বটে, কিন্তু দার পরিগ্রহ করিলেন না। কিরূপে মাতার অনুমতি গ্রহণ করিবেন, নিয়ত তাহার সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদা শঙ্করাচার্য্য মাতার সহিত গ্রামের অনতি-দূরে কোন আত্মীয়ভবনে গমন করিয়াছিলেন। পথি-মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। সেই নদীর জল নিতান্ত অল্প, এজন্য সকলে অনায়াসে তাহার পারে যাইতে পারিত; নৌকার প্রয়োজন হইত না। শঙ্করাচার্য্য গমন কালে অনায়াসে নদী পার হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রত্যাগমন সময়ে দেখিলেন বৃষ্টির জলে নদী পরি-পূর্ণ হইয়াছে, পার হইবার কোন উপায় নাই। ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া তাঁহারা পার হইবার জন্য নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। কিন্তু নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়া-ছিল যে, কিছুদূর গেলেই তাঁহাদিগের কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া গেল। প্রবল স্রোতে তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, মাতা পুত্রের জীবনা-শঙ্কায় নিতান্ত ভীতা ও কাতরা হইলেন। শঙ্করাচার্য্য মনোভিলাষ পূর্ণ হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া

জননীকে কহিলেন "মাতঃ! যদি আপনি আমাকে সন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে অনুমতি করেন, তবে এই বিষম সঙ্কট হইতে আমাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, নতুবা এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর সন্ন্যাসীর প্রতি নিতান্ত সদয়। আপনি আমাকে সন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে অনুমতি দিলে, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" জননী এই বিষম বিপদ কালে বিবেচনার অবসর না পাইয়া পুত্রের জীবনরক্ষার্থ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য যেন দ্বিগুণ বল লাভ করিয়া মাতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইলেন। পরে আত্মীয়গণের প্রতি মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া সময়ে সময়ে দেখা দিবেন ইত্যাদি বলিয়া মাতাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ঈপ্সিত প্রদেশে গমন করিলেন।

তিনি প্রথমে কর্ণাট দেশে গমন পূর্ব্বক তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। সেই স্থানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এক অনাদি অনন্ত ঈশ্বর এই জগতের মূল। তিনি দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ শক্তিকে

জগৎকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে পরস্পর বিভিন্ন নহেন, তাহাও ঐ সকল শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মনে ইহাও বিশ্বাস জন্মিল যে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানে সামান্য মৃৎপিণ্ডকে উপাসনা করিলেও ঈশ্বরোপাসনার ফল-লাভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সে সকলই সমান বোধ হইল। কিন্তু বৌদ্ধদিগের "ঈশ্বর নাই" বাক্য তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল। সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; এবং হিন্দুধর্ম্মের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে, যদি সে সময় শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কোন অসাধারণ বুদ্ধিশালী হিন্দুধর্ম্মের পরিরক্ষক রূপে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনেই উহা এক-কালে লয়প্রাপ্ত হইত। শঙ্করাচার্য্য স্বধর্ম্মের ঈদৃশী দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কাঞ্চীপুরের অধিপতি হিমশীতল নরপতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধপণ্ডিতে তাঁহার সভা পরিপূর্ণ থাকিত। শঙ্করা-চার্য্য প্রথমে সেই স্থানে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অলীকতার কথা প্রকাশ করিলে, রাজা ও পণ্ডিত-

মণ্ডলী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। শঙ্করাচার্য্য বিচারের প্রার্থনা করিলে, রাজা রোষপরবশ হইয়া কহিলেন "বৌদ্ধধর্ম্মের অলীকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা সামান্য ধৃষ্টতার কর্ম্ম নহে।" পরিশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, যিনি বিচারে পরাস্ত হইবেন তাঁহাকে ঘানি টানা দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। রাজা নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্ধপুরোহিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত শঙ্করাচার্য্যের অনেক বিচার হইল। তাঁহার অকাট্য যুক্তিবলে বৌদ্ধদিগের কূট তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, সকল পণ্ডিতকেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। রাজা তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের এই বিজয় বিবরণ শিবকাঞ্চী নামক শ্মশানেশ্বর শিবের দ্বারদেশে ও ভগবতীনদীর তীরস্থিত তেরুকোভেরুলির দেবমন্দিরে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত আছে। কাঞ্চীপুর হইতে তিনি তিরুপতিনামক স্থানে যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দক্ষিণ দেশের সমস্ত প্রদেশ পরাজয় করিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বিন্ধ্যাচল পার হইয়া বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন।

ও তত্রত্য বিবিধদর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নন্দন মিশ্রকে বিচারে পরাজিত করিলেন। এই প্রকারে তিনি কাশ্মীর বল্লভীপুর প্রভৃতি উত্তর ও পশ্চিম দেশীয় সমস্ত প্রদেশে জয়লাভ করিয়া কর্ণাট দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনরায় দক্ষিণ দেশের সকল স্থান ভ্রমণ ও স্থানে স্থানে বহুতর কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে উত্তর ও পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিয়া নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিলেন। পরিশেষে কাশ্মীররাজ্যে গমন করিয়া সরস্বতীপীঠে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া, দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কেদারনাথে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি যবন-দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে আর প্রত্যাগত হয়েন নাই।

এই অল্পকাল মধ্যে তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রচলন, স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া বেদান্তের চর্চ্চা বৃদ্ধি এবং বেদান্তদর্শন কঠাদি উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। না জানি দীর্ঘজীবী হইলে তিনি কি করিতেন। শঙ্করাচার্য্য

জন্ম গ্রহণ না করিলে এতদিন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও থাকিত কি না সন্দেহ। হিন্দুধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্যের নিকট যেরূপ ঋণী আছে; আর কাহারও নিকট সেরূপ ঋণী নহে। অদ্বৈতবাদ মত প্রচলিত করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি বলিতেন যাঁহারা তাহা বুঝিতে অসমর্থ তাঁহাদের শিবাদির উপাসনা করা উচিত। সেই জন্য তিনি অনেক স্থানে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

চাণক্য।

প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতবর চাণক্য বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অতি কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। কিন্তু প্রতিভা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে বোধ হয়, কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি যাহা করিব, মনে করিতেন তাহা সম্পন্ন না করিয়া কখন নিবৃত্ত, হইতেন না। দৃঢ় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবলে তিনি প্রবল-প্রতাপ মহানন্দ নরপতিকে সবংশে ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধ-সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রভুভক্ত অসাধারণ বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিবর রাক্ষসকে আয়ত্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

চাণক্য বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপনানন্তর গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করিতে যাইতে-ছিলেন, পথিমধ্যে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার পদ-তল কাটিয়া গেল, সুতরাং ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন তৎকালে তাঁহার বিবাহ হইতে পারিল না। ইহাতে তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রান্তর কুশশূন্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অনন্যমনে কুশ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার মূলে তক্র ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মহানন্দের অন্যতর মন্ত্রী শকটার এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি নিমিত্ত একাকী প্রান্তর মধ্যে ঈদৃশ ক্লেশকর ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন ?" চাণক্য কহিলেন "রোগ ও শত্রু অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে," এই বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় প্রদান ও প্রতিজ্ঞাবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শকটার পূর্ব্বে মহানন্দ ভূপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি শূদ্রজাতীয় হইলেও অসামান্য বুদ্ধিমান ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। ইঁহার স্বভাব অতিশয় উদ্ধত ছিল, তজ্জন্য তিনি অনেক সময়ে রাজার উপর অযথারূপ আধিপত্য প্রকাশ করিতেন। মহানন্দও অত্যন্ত গর্ব্বিত ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। শক-টারের এবংবিধ আচরণে তিনি ক্রমে এত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে, অবশেষে সহ্য করিতে না

পারিয়া এক দিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করেন। সেই কারাগারে মন্ত্রীর সমুদায় পরিবার আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করে। সেই সময় হইতে শকটার মনে মনে মহানন্দের বিষম শত্রু হয়েন ও নন্দবংশ উচ্ছেদ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি পুনরায় মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েন নাই, নিয়ত অবসর অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। চাণক্যের এই সকল কথা শ্রবণ ও তাঁহার ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, ইহার তুল্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী পুরুষ দৃষ্টি-গোচর হয় না। স্পষ্টই বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি সাতি-শয় বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ, কুটিল ও কোপনস্বভাব। এ ব্যক্তির সাহায্য পাইলে আমি অনায়াসে মহা-নন্দকে সবংশে বিনষ্ট করিতে পারিব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনন্তর চাণক্যকে কহিলেন, "মহাশয়! যদি অনুগ্রহ করিয়া নগরে চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে লোক দ্বারা প্রান্তর কুশশূন্য করিয়া দিতেছি।" চাণক্য মন্ত্রীর বচনে সম্মত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রান্তর কুশশূন্য করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

নগর মধ্যে তাঁহার চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইল। নানা

স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ আগমন করিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। চাণক্য সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতিভা দর্শনে সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া জানিল। অতি অল্প দিনেই তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল।

কিরূপে রাজার প্রতি চাণক্যের ক্রোধোৎপাদন করিয়া দিবেন, শকটার সর্ব্বদাই তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের প্রতি পাত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিবার ভার ছিল। কিন্তু শকটার স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিবাসনায় রাক্ষসের অজ্ঞাতসারে চাণক্যকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে রাক্ষস নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ কদাকার অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনাকে এখানে কে আনিয়াছে?" চাণক্য কহিলেন, আমাকে শকটার মন্ত্রী নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছেন। রাক্ষস এই কথা শুনিয়া আপনার আনীত ব্রাহ্মণটীকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রাদ্ধীয় সভায় আসিতেছিলেন,

রাক্ষস সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার আদেশে ইঁহাকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু শকটার একজন উদাসীন ব্রাহ্মণকে আনিয়া আসনে বসাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বরণীয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাবদন্ত, আরক্তনেত্র, ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। অতএব এক্ষণে মহারাজের যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।" মহানন্দ নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ও শকটারের প্রতি চিরবিদ্বেষসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং, তাঁহার আদেশ বিনা শকটার একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসাইয়া স্বয়ং প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি শকটারের প্রতি অধিকতর কুপিত হইলেন এবং দ্রুতগতি শ্রাদ্ধীয় সভায় উপস্থিত হইয়া চাণক্যের তথাবিধ কুৎসিত আকার দর্শনমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া একবারে শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। সভামধ্যে ঈদৃশ অপমান কেহই সহ্য করিতে পারে না। চাণক্য স্বভাবতঃ তেজস্বী ও ক্রোধপরায়ণ, রাজা তাঁহাকে যেমন উঠাইয়া দিলেন, অমনি তদীয় আরক্ত নয়ন ক্রোধে দ্বিগুণিত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ও শিখা আলুলায়িত হইল। তখন তিনি ভূতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন "রে দুরাত্মা

মহানন্দ! তুই আমাকে যেমন নিরপরাধে অপমানিত করিলি, তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হইবে। অহে সভ্যগণ! আমার নাম চাণক্য শর্ম্মা, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিলে, রাজা তোমাদের সমক্ষে নিরপরাধে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিলেন; এই উন্মুক্ত শিখাই নন্দবংশের কাল ভুজঙ্গী জানিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন নন্দবংশধ্বংস করিতে না পারিব, তত দিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিবে।" চাণক্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সভ্যগণ রাজার ঈদৃশ গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াও কিছু বলিতে না পারিয়া অধোবদনে রহিলেন।

চাণক্য ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে শকটারের ভবনে গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। শকটার, মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং চাণক্যের ক্রোধ বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনার পূর্ব্ব দুরবস্থা ও রাজার অসদাচরণের কথা বলিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহারা উভয়ে নন্দবংশোচ্ছেদের উপায়ান্বেষণে তৎপর হইলেন।

চাণক্য শকটারের নিকট জানিতে পারিলেন, রাজার আট পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্তই গুণবান্, সচ্চরিত্র, ধীরপ্রকৃতি এবং শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত। প্রজা-

রাও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে; কিন্তু তিনি ক্ষৌরকার তনয়ার গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে ঘৃণা করে। অন্য সপ্ত পুত্রের কোন গুণই নাই, তাহারা কেবল পিতার দোষভাগেরই উত্তরাধিকারী মাত্র। মহানন্দের ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিতান্ত অক্ষম। রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেবল রাক্ষসই যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি অতি পণ্ডিত, চতুর ও প্রভুভক্ত।

চাণক্য শকটারের মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, চন্দ্রগুপ্তকে সমীপে আনয়ন করিলেন ও তাঁহাকে মগধ রাজসিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া তাঁহাকে ও স্বকীয় শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য রসায়ন-শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এমন এক উৎকট বিষ প্রস্তুত করিতে পারিতেন যে, তাহা গাত্রসংলগ্ন হইলে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, চাণক্য রাজা ও রাজতনয়দিগের জন্য শকটারের নিকট বিষসংশ্লিষ্ট কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য পাঠাইয়া দেন। ঐ নির্ম্মাল্য স্পর্শে রাজা ও রাজতনয়গণের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, শকটার স্বয়ং মহানন্দকে বিনষ্ট করেন; তদীয় পুত্রগণ কিছুদিন রাজ্য করিলে, চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত সহ মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে নষ্ট করেন। রাজা ও রাজতনয়েরা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে,

মন্ত্রিবর রাক্ষস মহানন্দের ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন।

সৈন্য ব্যতিরেকে মগধসিংহাসন অধিকার করা অসাধ্য দেখিয়া, চাণক্য তৎসংগ্রহার্থ কিছুকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। পরিশেষে পর্ব্বতক নামক এক জন বন্য রাজার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। নন্দরাজ্য হস্তগত হইলে তাঁহাকে অর্দ্ধাংশ দান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া, চাণক্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পর্ব্বতক স্বভাবতঃ অত্যন্ত লোভ-পরতন্ত্র ছিলেন, সহজেই চাণক্যের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং তাঁহার সহিত যে সকল ম্লেচ্ছ রাজা-দিগের সৌহার্দ্দ ছিল, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পুত্র মলয়কেতু ও ভ্রাতা বৈরাধকসহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এইরূপে চাণক্য অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লইয়া কতিপয় দিবস মধ্যে কুসুমপুর অবরোধ করিলেন। পঞ্চদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল, প্রত্যেক যুদ্ধেই নাগরিকেরা পরাস্ত হইল। পরিশেষে রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি, রাজ্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া সংসারে থাকা নিতান্ত ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোবনে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষস মনে করিয়াছিলেন সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া কোন প্রবল নরপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সহসা রাজার

বৈরাগ্য অবলম্বন তাঁহার অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সর্ব্বার্থসিদ্ধির অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বৈরাগ্যাশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। পরে চন্দনদাস নামে এক ধনাঢ্য মণিকারের নিকট আত্মপরিজন সংগোপিত করিয়া স্বয়ং সর্ব্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তপোবন যাত্রা করিলেন। চাণক্যপ্রেরিত ক্ষপণকবেশধারী জীবসিদ্ধি চাণক্যকে রাজমন্ত্রীর তপোবন প্রস্থান অবগত করিয়া অমাত্যের সহচর হইলেন।

চাণক্য বিবেচনা করিলেন, যদি রাক্ষস সর্ব্বার্থসিদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া, কোন বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব এই বেলাই তাহার সবিশেষ উপায় করা কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বার্থসিদ্ধি জীবিত থাকিলে, আমার নন্দকুলোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞাও অসম্পূর্ণ থাকিতেছে।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি সর্ব্বার্থসিদ্ধির বধোদ্দেশে কতিপয় সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন; রাক্ষসের তপোবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা সর্ব্বার্থসিদ্ধির প্রাণ সংহার করিল। রাক্ষস এই সংবাদে সাতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং হতাশ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কয়েক দিবস নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিলেন।

চাণক্য মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বটে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া উচিত নয়। যদি মন্ত্রিবর রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইতে স্বীকা করেন, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত নিরাপদ হইতে পারেন, আমিও অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিতে পারি।” ইহা ভাবিয়া চাণক্য রাক্ষসকে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রভুভক্ত রাক্ষস তাঁহার সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। রাক্ষসের ন্যায় প্রভুভক্ত ব্যক্তি প্রভুর শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারেন না। কেবল এই উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে তিনি শত্রুর দমন জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেচনা করিলেন, পর্ব্বতকেশ্বরের সাহায্যই চাণক্যের একমাত্র বল, সুতরাং তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারিলে, চাণক্যকে পরাভূত করা যাইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পর্ব্বতকেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে মগধসিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর করিবেন বলিয়া চাণক্যের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। পর্ব্বতকেশ্বর সমস্ত রাজ্য প্রাপ্তির আশয়ে রাক্ষসের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ও রাক্ষসকে প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত

করিয়া তাঁহার প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন।

চাণক্য অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। কেহই তাঁহার কোন কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিত না, কিন্তু তিনি শত্রুপক্ষের অতি গূঢ় মন্ত্রণা সকলও অবগত হইতে পারিতেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই এক জন বিশ্বাসী অনুচরকে রাক্ষসের নিতান্ত প্রিয় সহচর করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে উক্ত বিবরণ অবগত হইয়া, প্রতিবিধান জন্য সর্ব্বত্রই গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা কেহ ক্ষপণক, কেহ আহিতুণ্ডিক ও কেহ ভিক্ষুক সাজিয়া কুসুমপুর ও পর্ব্বতক রাজবাটীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে চাণক্য প্রতিদিন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেরই সংবাদ পাইতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি অনায়াসে নগরমধ্যস্থ বিপক্ষগণের বিনাশসাধনে ও পর্ব্বতকরাজের মন্ত্রণা সকল অবগত হইয়া তৎপ্রতিবিধানে সক্ষম হইলেন। তাঁহার চমৎকার নীতিকৌশলে তদীয় নিতান্ত বিশ্বাসী লোকেরাই পর্ব্বতকেশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং তিনি তাঁহার হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশলের আশ্চর্য্য মহিমা এই যে, তাঁহারই একজন চর আর একজন চরকে স্বপক্ষ বলিয়া জানিতে পারিত না।

রাক্ষসও ঐরূপ অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের বধসাধন জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু চাণক্যের বুদ্ধিচাতুর্য্যে তৎসমুদায় বিপরীত-ফলপ্রসূ হইয়াছিল। সে সকল চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে স্বয়ং পর্ব্বতক ও রাক্ষসের গুপ্তচরগণেরই প্রাণবধের কারণ হইয়াছিল।

মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটকে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর যেরূপ বিবরণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

রাক্ষস যখন দেখিলেন, একাকী পর্ব্বতকেশ্বর হইতে চন্দ্রগুপ্তের পরাজয় সম্ভবপর নহে, তখন তিনি কলুত, মলয়, কাশ্মীর, সিন্ধু ও পারস্যরাজ্যে গমন করিয়া তত্তৎদেশের অধিপতিগণের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ঐ পঞ্চ নরপতি তাঁহার সাহায্য করিতে সম্মত হইলে, তাঁহাদের সৈন্যের সহিত পর্ব্বতকেশ্বরের সৈন্যের মিলন করিয়া তিনি কুসুমপুর অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহাতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশ ও চাণক্যের সহিত তাঁহার ভেদসাধন হয়, তজ্জন্য তিনি কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরকে চন্দ্রগুপ্তের শিল্পী, হস্তিপক, বৈদ্য ও বন্দীরূপে নিযুক্ত এবং তাঁহার বধসাধন জন্য একটী বিষকন্যা প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

চাণক্য বিষকন্যার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণহন্ত্রী বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি পর্ব্বত-কেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধূর্ত্ততার শাস্তি দিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, এই উপহার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও পর্ব্বতকেশ্বরের নিকট সেই কন্যা প্রেরণ করিলেন। রাত্রি মধ্যেই পর্ব্বতকেশ্বর নিহত হইলেন। পরে তাঁহার পুত্র মলয়-কেতু এখানে থাকিলে তাহাকে রাজ্যার্দ্ধ দিতে হইবে অতএব তাহাকেও এখান হইতে দূরীকৃত করা উচিত, এই ভাবিয়া ভাগুরায়ণ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা তাঁহাকে বলাইলেন 'চাণক্য পর্ব্বতকেশ্বরের প্রাণবধ করিয়াছেন, আপনারও বধসাধনের চেষ্টায় আছেন।' মলয়কেতু শুনিয়া রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভাগুরায়ণ প্রভৃতি চাণক্যের কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন। সুতরাং বিষকন্যা দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবিয়োগ না হইয়া বরং রাজ্যার্দ্ধ লাভ হইল। চাণক্য পরদিন প্রাতে নগরমধ্যে এইরূপ রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, পর্ব্বতকেশ্বর চাণক্যের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া রাক্ষস বিষকন্যা দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। রাক্ষস যে পর্ব্বতকেশ্বরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সে বৃত্তান্ত কেহ জানিত না, সুতরাং সক-লেই সে কথা বিশ্বাস করিল।

মলয়কেতু পলায়ন করিলে. পর্ব্বতকভ্রাতা বৈরোধক প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তখন চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত ও বৈরোধক উভয়কেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজভবন-প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। রাত্রিকালে চন্দ্রগুপ্ত রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবেন, এই বৃত্তান্ত নগরে প্রচারিত হইল। তোরণ-সংস্কার, নগর পরিষ্কার ও মাঙ্গল্যসংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সেই দিন নগরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, সকলেই চন্দ্রগুপ্তের রাজভবন-প্রবেশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। কিন্তু চাণক্য রাক্ষসের অভি-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্তের বেশে সুসজ্জিত ও রাজানুচরবর্গে বেষ্টিত করিয়া হস্তীতে আরোহণ করাইয়া রাজভবন যাত্রা করিলেন। একতঃ রাত্রিকাল, তাহাতে যথাবিধ রাজ-পরিচ্ছদ পরিধানে, সকলেই বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত ভাবিল। প্রথম দ্বারে রাক্ষসের অনুচর শিল্পী ছিল এবং হস্তিপকও রাক্ষসের অনুচর। বৈরোধক যেমন প্রথম দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি শিল্পী তোরণপাত দ্বারা এবং হস্তিপক মৃদু হস্তিচালন দ্বারা চন্দ্রগুপ্তভ্রমে বৈরোধকের প্রাণবধ করিল। ঐ সঙ্গে হস্তিপক ও শিল্পীরও মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্ট না হইয়া উপকার হইল। বিনাযুদ্ধে রাজ্যার্দ্ধভাগী বৈরোধকের প্রাণনাশ

হইল। বৈদ্য প্রভৃতিও ঐরূপে আপনারাই বিনষ্ট হইল।

চাণক্যের কৌশলে সকল উপায় ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া, রাক্ষস বিবেচনা করিলেন, চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। চাণক্য যেরূপ অভিমানী ও কোপনস্বভাব, তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ অবমানিত করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এই মনে করিয়া, তিনি কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় বন্দী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা নিয়ত নানা ছন্দে চন্দ্রগুপ্তের শক্তির প্রশংসা এবং চাণক্যের গর্ব্ব, অন্যায় প্রভুত্ব ও অন্যায়াচরণে রাজ্যস্থ সকল লোকের বিরক্তি প্রভৃতির কথা প্রকাশ করিত। চাণক্য তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলেন 'তাহারা চন্দ্রগুপ্তের সহিত আমার ভেদসাধন করিবার জন্য রাক্ষসকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে।' কিন্তু তিনি ঐ ভেদসাধন দ্বারাই চন্দ্রগুপ্তের উপকার করিবেন ভাবিয়া, আপনিই ভেদসাধনের উপায় করিয়া দিলেন,—তিনি কুসুমপুরের চিরকালের প্রমোদকর কৌমুদীমহোৎসবের আমোদ বন্ধ করিয়া দিলেন।

চাণক্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সমস্ত কার্য্য করেন এবং তিনি চাণক্যের মত না লইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়েই

চন্দ্রগুপ্ত বিরক্ত হইতেন। মনে মনে ভাবিতেন এরূপ নামমাত্র রাজা হওয়া অপেক্ষা রাজ্য না করাই ভাল। রাক্ষসানুচর বন্দিগণ তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছিল। এই সুযোগ পাইয়া তাহারা তাঁহাকে আরও চঞ্চল করিল। চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি হইলেও সে দিন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সে দিন চাণক্যের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাগাইবার জন্যই কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি চন্দ্রগুপ্তের কথায় এরূপ গর্ব্বপূর্ণ উত্তর দিলেন যে, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন। তখন চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার মনোবাদ হইয়াছে, এ কথা শত্রুপক্ষের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য চাণক্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "বৃষল! তুমি আমার অচিরনির্ব্বাপিত ক্রোধানল পুনরায় প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, রাক্ষসকে মন্ত্রী করিবার তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, আচ্ছা তাহাকে মন্ত্রী কর, আমি এই প্রস্থান করিলাম।" এই বলিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! তুমি ভাবিয়াছ

চন্দ্রগুপ্তের সহিত আমার ভেদসাধন করিয়া দিয়া তাহাকে পরাজিত করিবে। ভেদ সাধন হইল বটে, কিন্তু ইহাতে তোমারই অভিলাষ পূর্ণ হইবার ব্যাঘাত হইবে।

তদনন্তর চন্দ্রগুপ্ত প্রচার করিয়া দিলেন "অদ্যাবধি আমারই আদেশ মত সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, চাণক্যের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না" অবিলম্বেই এই সকল কথা রাক্ষসের শ্রবণগোচর হইল। তখন তিনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কুসুমপুর অবরোধের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চনৃপতির সৈন্যের সহিত মলয়কেতুর সৈন্য মিলিত হইল, যুদ্ধের সমুদায় সজ্জা প্রস্তুত হইল। কিন্তু চাণক্যের বুদ্ধিচাতুর্য্যে বিনা যুদ্ধেই চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভ হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতে যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎ-সমুদয় চিন্তা করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। বোধ হয়, চাণক্যের তুল্য বুদ্ধিমান, সুচতুর, রাজনীতি বিশা-রদ পণ্ডিত পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই।

চাণক্য পূর্ব্ব হইতে স্বকীয় বিশ্বাসী অনুচর জীব-সিদ্ধিকে রাক্ষসের এবং সিদ্ধার্থককে অমাত্যের পরম বন্ধু শকটদাসের প্রিয়সহচর করিয়া দিয়াছিলেন; পরে ভাগুরায়ণ, ভদ্রবট প্রভৃতি কতকগুলি লোককে

মলয়কেতুর বিশ্বাসপাত্র করিয়া দিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে দিয়াছিলেন। পরিশেষে উহাঁদের প্রতি রাক্ষসের ও মলয়কেতুর দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন যে, তাহাতে সকলেরই বুঝিতে হইল যে, তাহারা চন্দ্রগুপ্তের অহিতকারী এবং রাক্ষস ও মলয়কেতুর পরম হিতকারী। চাণক্য এরূপ ভাণ করিলেন, যেন তিনি জানিয়াছেন জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস রাক্ষসের নিতান্ত হিতকারী ও চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টকারী। সেই জন্য তিনি প্রকাশ্যে জীবসিদ্ধিকে নির্ব্বাসিত করিতে, শকটদাসকে শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে, এবং যাবৎ চন্দনদাস রাক্ষসের পরিবারবর্গকে অর্পণ না করে, তাবৎ তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিলেন। ঐ অনুমতি অনুসারে জীবসিদ্ধি নির্ব্বাসিত হইয়া রাক্ষসের নিকট গেল, চন্দনদাস কারাবদ্ধ হইল এবং শকটদাস বধ্যভূমিতে নীত হইল। ঐ সময়ে সিদ্ধার্থক চাণক্যের নিয়োগানুসারে বধ্যভূমি হইতে বলপূর্ব্বক শকটদাসকে উদ্ধার করিয়া রাক্ষসসমীপে লইয়া গেল। সুতরাং জীবসিদ্ধি ও সিদ্ধার্থক রাক্ষসের ও মলয়কেতুর অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইল। ইতিপূর্ব্বে দৈববশতঃ চাণক্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয়মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি ভবিষ্যৎসময়োপযোগী

একখানি পত্র রচনা করিয়া, তাহা সিদ্ধার্থক দ্বারা শকট-দাসের হস্তাক্ষরে লিখাইয়া লইয়াছিলেন ও তাহাতে ঐ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া সেই পত্র মুদ্রাসহ সিদ্ধার্থকের নিকট দিয়া যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থক গোপনভাবে সেই পত্র ও মুদ্রা আপনার নিকট রাখিয়াছিল।

কিছু পূর্ব্বে মলয়কেতু রাক্ষসকে বহুমূল্য তিনখানি অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থক পরমমিত্র শকটদাসের প্রাণ রক্ষা করায় রাক্ষস সেই অলঙ্কার গুলি তাহাকে প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থক চাণক্যের উপদেশানুসারে ঐ অলঙ্কার গ্রহণ না করিয়া "এই গুলি এই মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিউন, পরে গ্রহণ করিব" ইহা বলিয়া রাক্ষসের সেই মুদ্রা প্রদান করিল। রাক্ষস আপন মুদ্রা দর্শনে চিনিতে পারিয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করিলে সিদ্ধার্থক কহিল 'উহা আপনার হয় গ্রহণ করুন।' রাক্ষস অতিশয় প্রীত হইয়া অলঙ্কারগুলি মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং আপন মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি সেই মুদ্রাচিহ্ন ব্যবহার করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, রাক্ষস উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিলেন—

পূর্ব্বোক্ত রাজগণের ও মলয়কেতুর বহুতর সৈন্য মিলিত করিয়া কুসুমপুর অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। কুসুমপুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শিবির স্থাপন করিলেন। শত্রুপক্ষের কোন লোক কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে মলয়কেতু নিয়ম করিলেন তাঁহার নামাঙ্কিত ছাড় ভিন্ন কেহ শিবির হইতে বহির্গত বা কেহ অন্য স্থান হইতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। মুদ্রার ভার ভাগুরায়ণের উপর প্রদত্ত হইল। চাণক্য এ পর্য্যন্ত যে সকল কৌশলজাল পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল ফলবান হইবার অবসর প্রাপ্ত হইল। উপযুক্ত অবসর দেখিয়া সিদ্ধার্থক শকটদাসলিখিত সেই পত্র ও মন্ত্রিপ্রদত্ত অলঙ্কারগুলি লইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, জীবসিদ্ধিও সেই সময় শিবির হইতে বাহির হইবার জন্য ছাড় লইতে গেল। কি জন্য সে বাহিরে যাইবে জিজ্ঞাসিত হইলে, সে কিছুতেই বলিতে চাহিলনা। কিন্তু যখন না বলিলে আর চলে না, তখন যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, রাক্ষস প্রথম হইতেই পর্ব্বতকের শত্রু ; তিনি বিষকন্যা দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন এবং এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলিত হইয়া এই সন্ধি করিতেছেন যে, তিনি তাঁহার মন্ত্রী হইবেন এবং মলয়কেতুর রাজ্য অপর রাজাদিগকে

ভাগ করিয়া দিবেন ; সেই কথা অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সময়ে বিনা ছাড়ে চলিয়া যাইতেছে, বারণ করিলে শুনে না, মন্ত্রীর সুহৃদ্ বলিয়া আস্ফালন করে”, এই অপরাধে সিদ্ধার্থক ধৃত হইল। তাহাকে টানাটানি করাতে তাহার নিকট হইতে রাক্ষসের নামাঙ্কিত সেই পত্র ও অলঙ্কার বাহির হইল। সেই পত্রে যাহা লেখা ছিল তাহাতে জীব-সিদ্ধির কথা প্রমাণিত হইল। একতঃ সিদ্ধার্থক ও জীবসিদ্ধি রাক্ষসের নিতান্ত অনুগত সুহৃদ্ বলিয়া খ্যাত, তাহাতে সেই পত্র রাক্ষসের মুদ্রাযুক্ত ও তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ শকটদাসের হস্তলিখিত। আবার তাহারা যাহা বলিয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বলে নাই, যখন না বলিলে নয় তখনই বলিয়াছে ; বিশেষতঃ চাণক্য পূর্ব্ব হইতে এমত সকল অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন, তাহাতে মলয়কেতুর মনে রাক্ষসের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল কথার প্রতি মলয়কেতুর কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া রাক্ষসের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু চাণক্য ভাগুরায়ণ প্রভৃতিকে বার বার বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন কোন ক্রমে অমাত্যের অত্যাহিত না ঘটে। সেই জন্য ভাগুরায়ণ প্রভৃতির কৌশলে রাক্ষসের প্রাণ রক্ষা হইল।

মন্ত্রিবর রাক্ষস যাঁহার হিতের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার দ্বারা এরূপ অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন। বিশেষতঃ চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে আপনার সমস্ত কৌশলজাল ছিন্ন হইল ও সেই জালে আপনাকেই আবদ্ধ হইতে হইল দেখিয়া, ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইল। কিন্তু প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই দেখিয়া তপোবনযাত্রা করাই স্থির করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি চাণক্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। তখনও তাঁহার নিকট যে বিশ্বস্ত লোক রহিয়াছে, সেও যে চাণক্যের অনুচর তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সহচর উন্দুরায়ণের প্রতি চাণক্য এই ভার দিয়াছিলেন যে, অমাত্য যখন মলয়কেতু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবেন, তখন যাহাতে তিনি কুসুমপুরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনীত হয়েন তাহা করিবেন। তদনুসারে উন্দুরায়ণ নানা কৌশলে এবং প্রিয় সুহৃদ্ চন্দনদাসের কি হইল, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত ইত্যাদি বলিয়া রাক্ষসকে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে লইয়া গেলেন।

চাণক্য যখন বুঝিলেন, রাক্ষসের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আগমনের সময় হইয়াছে, তখন তিনি দুইজন সুহৃদ্‌কে কহিলেন, তোমরা চণ্ডালবেশ ধারণপূর্ব্বক চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া এখনও রাক্ষসের পরিজনবর্গকে

সমর্পণ কর নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড হইবে” এই বলিয়া তাহার প্রাণবধের উদ্যোগ কর। এ দিকে রাক্ষস নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়াই চাণক্যপ্রেরিত গুপ্তচরের মুখে চন্দনদাসের শূলারোপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, “কি! এখনও আমার হস্তে অস্ত্র থাকিতে আমি প্রিয়বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিব না?” সহ-চর উন্দুরায়ণ তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, “যদি বন্ধুর প্রাণ রক্ষা ইচ্ছা করেন তবে এরূপ উপায় অব-লম্বন করিলে, মনোরথ সিদ্ধ না হইয়া বিপরীত সংঘটিত হইবে। কেন না শকটদাসকে বলপূর্ব্বক বধ্যভূমি হইতে লইয়া যাওয়া অবধি রক্ষিবর্গ সাবধান হইয়াছে। আপ-নাকে সশস্ত্র যাইতে দেখিলেই আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দনদাসের প্রাণবধ করিবে।” রাক্ষস উহা সঙ্গত বোধ করিলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বন্ধুর উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া “চন্দনদাসকে বধ করিও না—যাহার জন্য চন্দনদাসের প্রাণদণ্ড হইতেছে সে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত।” এই বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে বধ্যভূমিতে গমন পূর্ব্বক চণ্ডালবেশধারী পুরুষদিগের নিকট হইতে চন্দন-দাসকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “যাও তোমরা চাণক্যকে বল, যাহার জন্য চন্দনদাসের প্রাণদণ্ড হইতেছে সে নিজে উপস্থিত, তাহারই প্রাণদণ্ড হউক।” তাহারা

রাক্ষসকে চিনিত, সুতরাং কোন বাধা না দিয়া তৎ-ক্ষণাৎ চাণক্যের নিকট যাইয়া বলিল। চাণক্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, শুনিবামাত্র বহির্গত হইয়া বধ্যভূমিতে গমন করিলেন। রাক্ষস দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "সত্বর আসুন, ত্বরায় আমার প্রাণ লইয়া নিরপরাধী চন্দনদাসকে ছাড়িয়া দিউন।" চাণক্য নিকটে গমন করিয়া অমাত্যের চরণ ধারণপূর্ব্বক "মহাশয়; বিষ্ণুগুপ্ত প্রণাম করিতেছে আশীর্ব্বাদ করুন" এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, "যদি বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা জীবনবিনিময়ে হইবে না,—তাহা হইলে এই মন্ত্রিগ্রাহ্য অস্ত্রখানি লইতে হইবে।" এই বলিয়া রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদগ্রহণ করিতে অস্বীকার করা অবধি তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চন্দ্রগুপ্তও যথাবিধি প্রণামাদি দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিলেন। তখন রাক্ষস আর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। চাণক্য তাঁহাকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে মলয়কেতু রাক্ষসকে তাড়াইয়া দিয়া অপর রাজাদিগকে অপমানিত করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার

আপন সৈন্যগণও তাঁহার অবাধ্য হইল। সময় পাইয়া ভাগুরায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত-সমীপে আনয়ন করিল। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে চাণক্য প্রবল শত্রু পরাজয় করিলেন। মলয়কেতুর প্রতি কিরূপ আচরণ করা যায়, এই কথা যখন চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন চাণক্য কহিলেন, "এখন হইতে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না; মন্ত্রিবর রাক্ষসের পরামর্শ লইয়া সমস্ত কার্য্য কর।" তখন তিনি রাক্ষসের পরামর্শে মলয়কেতুর বন্ধন মোচন করিয়া স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিলেন। চাণক্য প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত ও চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্কণ্টক করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিয়া সুখী হইলেন। পরে ঐ সকল সকার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে যে সকল অন্যায় কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তপোবনযাত্রা করিলেন, এবং বিষয়বাসনা সকল একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত। অনেকে অনুমান করেন, সুবিখ্যাত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক গ্রন্থ চাণক্যেরই প্রণীত। ঐ গ্রন্থদ্বয়ে রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র অতি চমৎকাররূপে আলোচিত হইয়াছে। চাণক্যের শ্লোক

নামে যে সকল উৎকৃষ্ট নীতিপূর্ণ শ্লোক প্রচলিত আছে তাহার অধিকাংশই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আছে। পঞ্চতন্ত্র গদ্য পদ্য এবং হিতোপদেশ গদ্যময় গ্রন্থ। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় নীতিপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই। সভ্যজাতি মাত্রই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের সমাদর করেন। সকলেই উহা আপন আপন ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন; হিতোপদেশ যত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাইবেল ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই তদ্রূপ হয় নাই।

চাণক্য অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, অসাধারণ বুদ্ধিমান্, অসামান্য অর্থ ও নীতিশাস্ত্রবেত্তা, অসাধারণ অধ্যবসায়শালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিষয়-লোভ-পরিশূন্য ও নিতান্ত তেজস্বী ছিলেন। তিনি নিয়ত কঠিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, অথচ এককালে স্বার্থহীন ও কামনাশূন্য ছিলেন। এত যত্ন ও শ্রম করিয়া যে রাজ্য অর্জ্জন করিলেন, তাহা অনায়াসে চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিলেন। মন্ত্রিপদও আপনি গ্রহণ করিলেন না। নিঃস্বার্থভাবেও যে, দৃঢ়মনঃসংযোগের সহিত কার্য্য করা যায়, নিষ্কামধর্ম্ম যে আকাশকুসুমবৎ অলীক বাক্য মাত্র নহে, চাণক্য তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

বিজয়সিংহ।

প্রায় ২৫ শত বৎসর অতীত হইল, রাজকুমার বিজয়সিংহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহারাজ সিংহ-বাহু ও মাতার নাম সিংহবল্লী। বিজয়সিংহের রাজ্য-কালের কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যৌবনকালে পিতার সহিত তাঁহার বিবাদ হয়, তন্নিমিত্ত সিংহবাহু ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। বিজয়-সিংহ নির্ব্বাসিত হইয়া প্রায় পঞ্চ শত সহচর সমভি-ব্যাহারে স্বদেশের নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া পোতারোহণ করিলেন। এক পোতে তিনি ও তাঁহার সহচরেরা এবং অপর এক পোতে তাঁহাদিগের স্ত্রীগণ ছিল। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে রমণীদিগের পোত নিরুদ্দেশ হইল ও পুরুষদিগের পোত সিংহলতটস্থ বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বিজয়সিংহ সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে কিছুকাল মৃতপ্রায় হইয়া সেই বালুকার উপর শয়ান থাকেন। সিংহলতটস্থ বালুকা তাম্রবর্ণ। তাঁহার হস্ত ঐ বালুকার উপর নিপতিত থাকিয়া তাম্রবর্ণ হও-য়াতে তিনি তাম্রপাণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিজয়সিংহ সংজ্ঞালাভানন্তর শ্রান্ত সহচরদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া সঙ্গে লইয়া লঙ্কাদেশ দর্শনার্থ গমন করিলেন। ঐ সময়ে যক্ষেরা সিংহল দ্বীপের অধিবাসী ছিল। তথাকার অধিপতি বিজয়সিংহকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে যক্ষরাজের সহিত রাজকুমারের সৌহার্দ্দ জন্মিল; যক্ষরাজ-স্বীয় তনয়া কুবেণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিজয়সিংহ রাজার ঈদৃশ অনুগ্রহের উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া কোন পর্ব্বোপলক্ষে হঠাৎ রাজধানী আক্রমণও অধিকার করিলেন। বিজয়সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যেমন লঙ্কার রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন, সেইরূপ আর একটি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজ্য লাভ করার কিছু দিন পরে কুবেণীকে অসভ্য রমণী দেখিয়া আর একটি বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। সেই উদ্দেশে তিনি ভারতবর্ষীয় কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ডুরাজ্যাধিপতি স্বীয় আত্মজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। বিজয়সিংহ পরম সুন্দরী আর্য্যরমণী প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগা কুবেণীকে দুইটি শিশু সন্তানের সহিত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অনাথা রমণী পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখে ও অভিমানে বনমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। সিংহলে এরূপ প্রবাদ

এখনও প্রচলিত আছে যে, কুবেণীর আত্মা প্রতি রজনীতে কুবেণী-গুহা-পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া নিষ্ঠুরস্বরে স্বদেশের অমঙ্গল কামনা করে।

বিজয়সিংহ এইরূপ কয়েকটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সিংহলের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রশস্ত রাজমার্গ ও সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সিংহল দ্বীপকে সুশোভিত ও সুব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি দ্বারা রাজকার্য্যের সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহ উপাধি হইতে লঙ্কার নাম এবং তাম্রপাণি নাম হইতে উহার তাম্রপর্ণি নাম হয়। রোমীয়েরা ঐ তাম্রপর্ণি শব্দের অপভ্রংশ করিয়া সিংহল দ্বীপকে 'তাপ্রবেন' বলিত। বিজয়সিংহের পর ইংরেজ ভিন্ন অপর কোন জাতিই সিংহলদ্বীপ অধিকার করিতে পারে নাই। সুতরাং বাঙ্গালী বিজয়সিংহের বংশ বহুশতাব্দী সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয়সিংহের জীবনের অতি অল্প মাত্র ঘটনা জানা গিয়াছে। যাহা জানা গিয়াছে তাহার মধ্যে মহত্ত্বব্যঞ্জক ও অনুকরণ যোগ্য কার্য্য অতি অল্প, ঘৃণাকর ও অকর্ত্তব্য কার্য্যই অধিক। সুতরাং আদর্শচরিত-বর্ণন গ্রন্থে তাঁহার নাম উঠিবার তত যোগ্য নয়। কিন্তু অনেক লোকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গালী

জাতি নিতান্ত আধুনিক ও চিরদুর্ব্বল। বিজয়সিংহের বৃত্তান্ত পাঠে সেই ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত হইবে বলিয়া আর্য্যচরিতে তাঁহার বিষয় বর্ণিত হইল। ইহা দ্বারা জীবনচরিত পাঠের সম্যক্ ফল লাভ না হইলেও অন্ততঃ ইহা জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীদিগের বাহুবল ছিল ও তাঁহারা বিদেশীয় রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন।

সমাপ্ত।